এক যে কুমির, এক যে শেয়াল

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক যে ছিল কুমির। বাস করত এক নদীতে। নদীর পাড়ের কাছাকাছি অল্পসল্প জলে ঘুরেফিরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। সেই নদীর কিনারায় ছিল একটি পাথর। তারই নীচে থাকত ছোট্ট এক কাঁকড়া।

কাঁকড়া আর কুমিরের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। দুজনে মুখোমুখি বসে অনেকদিন গল্প আর গল্পে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিত।

বেজায় খিদে পাওয়াতে কুমির একদিন নদীর কিনারায় সেই পাথরের কাছাকাছি কাঁকড়ার ঘরের দোরগোড়ায় এসে হাঁক পাড়ল, কাঁকড়াভাই, বাড়ি আছো?

-কে? কাঁকড়া মুখ বাড়িয়ে জবাব দিল।

তারপর কাঁকড়া কুমিরকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বলল, বলো কী খবর?

কুমির চারপাশ দেখে নিয়ে একটু নিচু গলায় কাঁকড়াকে বলল, শোনো ভাই কাঁকড়া ছোট্ট বন্ধু আমার, একটা কাজ করতে হবে। যাও, একবারটি শেয়ালকে জল খাবার জন্যে ডেকে আনো। সে যখন মনের সুখে জল খেতে থাকবে, সেই সুযোগে আমি ওকে খেয়ে ফেলব।

শেয়ালের কথা শুনে কাঁকড়া চুপচাপ বসে রইল। কোনো কথা বলল না। নড়লও না। কাঁকড়ার মধ্যে কোনোও ভাবান্তর না দেখে কুমির বলে উঠল, কী হে ভায়া, চুপচাপ বসে রইলে যে? তোমাকে যা করতে বললাম, করলে না যে!

কুমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁকড়া জবাব দিল, গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমি বললেও শেয়াল জল খেতে আসবে না। শেয়াল ভালো করেই জানে যে, তুমি এই নদীতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকো। কখনও মড়ার মতো ভেসে থাকো। সুতরাং শেয়াল আমার কথায় মোটেও বিশ্বাস করবে না। সে বড়ো বেশি চালাক।

নদীর ধারে সবুজ গাছপালার ভেতরে ছিল একটা সুন্দর ফুলের গাছ। সবসময় ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থাকত গাছটা। গাছের চারপাশও ঝরে পড়া ফুলে ভরতি হয়ে থাকত সবসময়। মনে হত, যেন ফুলের বিছানা কেউ সাজিয়ে রেখেছে। অনেক ভেবেচিন্তে কুমির বলল, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে।

– কী? কাঁকড়া জিজ্ঞাসা করল।

কুমির বলল, শোনো, আমি নদীর পাড়ে এসে মরার ভান করে শুয়ে থাকব। তুমি ওই ফুল এনে আমার সারা শরীর ঢেকে ফেলবে। কেউ মরে গেলে যেমন করে ফুল দেওয়া হয়ে থাকে আর কি ! আমার এমন দশা দেখতে পেলে, শেয়াল পরম নিশ্চিন্তে ঠিকই জল খেতে আসবে।

যেমন কথা, তেমন কাজ। পরিকল্পনাটা কাঁকড়ারও মনে ধরল। নদীর পাড়ের ফুলগাছটার কাছাকাছি কুমির মড়ার মতো পড়ে রইল। একটা একটা করে ফুল এনে কাঁকড়াও ঢেকে ফেলল কুমিরের প্রায় সারা শরীর। তারপর সে চলল শেয়ালের সন্ধানে।

শেয়ালের সঙ্গে দেখা হতেই কাঁকড়া বলল, কী শেয়ালদাদা, নদীতে জল খেতে যাবে না? অনেকদিন তো তুমি জলটল খেতে যাচ্ছ না। নদীর জলটা কিন্তু আজকাল আরও বেশি পরিষ্কার।

—যাবো কী করে। শয়তান কুমিরটা তো ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। তেষ্টা থাকলেও জল খাবার উপায় কোথায়? শেয়াল উত্তর দেয়।

—আর ভাবনা নেই। এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারবে।

– কেন, কেন? শেয়াল জানতে চেষ্টা করে।

কাঁকড়া এবার জবাব দেয়, ও আপদ বিদায় হয়েছে। ফুলগাছটার তলায় গিয়ে দেখবে চলো কুমিরটা কেমন মরে পড়ে আছে। ফুল দিয়ে সাজিয়ে এইমাত্র আমি আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এলাম। শত হলেও বহুদিন তো পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

কাঁকড়ার কথায় শেয়াল এল কুমিরকে দেখতে। চুপচাপ শুয়ে ছিল কুমির। সারা শরীর তার ফুলে ফুলে ঢাকা। শেয়াল খুব ভালো করে দেখল সবকিছু। তারপর কাঁকড়াকে বলল, কুমিরভায়া বেঁচে নেই, সত্যিই খুব দুঃখের কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খুব অবাক লাগছে। জানলে, আমাদের দেশে কুমির যখন মারা যায়, তখন কিন্তু তারা লেজ ধীরে ধীরে নাড়তে থাকে ! শেয়ালের কথা কানে যেতেই কুমির হঠাৎ তার লেজ নাড়তে শুরু করে। তা দেখেই শেয়াল সেখান থেকে দে ছুট।

—নদীতে আর জল খেয়ে কাজ নেই। কথাগুলি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই বনের আড়ালে মিলিয়ে যায় শেয়াল।

আলসে মশাই

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

জঙ্গলে বুনো এক পেয়ারা গাছের তলায় একটা লোক থাকত। তাকে সবাই আলসেমশাই বলে ডাকত। সবাই এ নামে ডাকত কারণ সে ভীষণ অলস ছিল; জীবনে একটা জ দিনও কোনো

কাজ করেনি। এমনকি খাবার জোগাড়ের জন্যও সে চাষবাস বা শিকার করত না। তার একটাই কাজ ছিল। সারাদিন পেয়ারা গাছের তলায় বসে থাকা আর অপেক্ষা করা কখন গাছ থেকে ফল ওর মুখে এসে পড়ে। লোকে ওকে গালাগাল করত, ইট পাটকেল ছুড়ত। কিন্তু তাতে তার কিছু এসে যেত না। আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু কাজ করতে হয় সেটুকু পরিশ্রমও করতে চাইত না।

একদিন দারুণ ঝড়ে ওই গাছের কিছু পেয়ারা বাতাসে উড়ে দূরে গিয়ে পড়ল। রাজার ভাগনি তখন জলের ধারে বসে ছিল। বাতাসে উড়ে আসা একটা পেয়ারা ও তুলে নিয়ে খেল। এত ভালো কোনও ফল সে আগে খায়নি। সে প্রতিজ্ঞা করল এই পেয়ারাগাছ যার তাকে বিয়ে করবে। সে রাজাকে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা জানাল। রাজা আশ্বাস দিলেন যে ওই পেয়ারাগাছ যার তাকে খুঁজে বার করবেনই। তিনি ওই দেশে যাদের যাদের পেয়ারাগাছ আছে তাদের প্রত্যেককে গাছের একটা করে পেয়ারা নিয়ে রাজদরবারে আসতে আদেশ দিলেন। রাজার ভাগনি সবার আনা পেয়ারা খেয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কারুর পেয়ারাই সেদিনকার সেই বাতাসে উড়ে আসা পেয়ারার মতো সুস্বাদু বলে মনে হল না। রাজা আর কারও পেয়ারাগাছ আছে কি না খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে আর একটামাত্র পেয়ারা –গাছ আছে। তবে সে গাছের মালিক এতই অলস যে রাজার ভাগনির সঙ্গে বিয়ে হতে পারে জেনেও রাজদরবারে পেয়ারা নিয়ে আসেনি।

রাজার ভাগনি একথা শুনে ঠিক করল যে সে নিজেই ওই পেয়ারাগাছের মালিকের সঙ্গে দেখা করে পেয়ারা খেয়ে আসবে। ওই গাছের পেয়ারা খেয়েই ও বুঝতে পারল যে এই সেই পেয়ারা। ও রাজাকে গিয়ে জানাল যে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ও আলসেমশাইকে বিয়ে করবে। রাজা কী আর করেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আলসেমশাইয়ের সঙ্গে ভাগনির বিয়ে দিলেন। তবে রাজা তাঁর ভাগনিকে ওর প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করলেন, আর প্রাসাদেও থাকতে দিলেন না।

আলসেমশাই রাজার ভাগনিকে বিয়ে করে গাছের তলায় বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকল। আলসেমশাইকে ওর স্ত্রী খুবই ভালোবাসত। যা কাজের দরকার পড়ত তা ওর স্ত্রীই করে দিত।

কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ওদের জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এল। পেয়ারাগাছে পেয়ারা হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর ওর স্ত্রীও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। আলসেমশাই ওর স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। এর আগে কেউ কোনোদিন আলসেমশাইয়ের সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করেনি, বা এত যত্ন করেনি। বাধ্য হয়ে আলসেমশাই বউকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করতে শুরু করল। সে চারদিকে আরও পেয়ারাগাছ পুঁতল। সে সব গাছের পেয়ারা খেয়ে আর ওর সেবাযত্নে ওর বউ সুস্থ হয়ে উঠল।

আলসেমশাই যে কাজ করা শুরু করেছে এ খবরটা রাজার কাছেও পৌঁছোল। তাছাড়া ও যেভাবে রাজার ভাগনিকে সুস্থ করে তুলেছে, সে খবরে রাজা খুশি হয়ে ওদের প্রাসাদে ডেকে আনলেন।

প্রাসাদে আসলেমশাই খুব আরামে থাকতে শুরু করল। আগের মতোই কোনও কাজ করতে হত না। সে শুধু মনে মনে ভাবত যখন আমি গরিব আর অলস ছিলাম তখন সবাই আমাকে

গালাগাল দিত। আর এখন আমি ধনী হওয়ার পর আমার আলস্য দেখেও তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে। এই অদ্‌ভুত ব্যাপার দেখে, এর কোনও মাথা মুন্‌ডু খুঁজে না পেয়ে ও খালি হাসত।

কার পাতে আগে

অশোককুমার মিত্র

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। এক নিমন্ত্রণে হাজির এক হরিণ, এক খরগোশ আর এক ব্যাং। গল্পগাছায় গড়াল বেলা। এল খাবার সময়। সে-গাঁয়ে এক মজার নিয়ম ছিল— ভোজসভায় হাজির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো তার পাতে সবার আগে খাবার দিতে হবে। এবারে গোল বাঁধল এ আসরে সবচেয়ে বেশি বয়সি কে তা নিয়ে।

আমার কী বাপু বয়সের আর গাছপাথর আছে, আমিই হচ্ছি সবচেয়ে বুড়ো। মাথার শিং নাড়িয়ে হরিণ বললে, এ পাতা থেকেই পরিবেশন শুরু করো।

আঃ কী পাগলের মতো বকছ? — খরগোশ আপত্তি জানাল, আমি হচ্ছি সবার বড়ো এ তো সকলে জানে। আগে আমার পাতে খাবার দাও--বলে সে তার পাতা সাজিয়ে ফেলল। দাঁড়াও দাঁড়াও বাপু এক মিনিট, তোমরা তো দুজনেই বলছ যে বয়স হল সবচেয়ে বেশি, তা তার কোনো প্রমাণ দিতে পারো কি? প্রথমে হরিণ-ই বলুক, তারপর খরগোশ বলবে। হরিণ বললে, আচ্ছা শোনো, বলছি আমি কত বড়ো। ওই যে নীল আকাশের গায়ে দেখেছ তো কত কত তারা আছে। ওই তারাগুলো যখন পেরেক দিয়ে আকাশে আটকানো হচ্ছিল তখন কোথাও অসুবিধে হলে ওরা আমার কাছে আসত। আমি ওদের অসুবিধে মিটিয়ে দিতাম।এবারে বোঝো আমার বয়স কত?

তার কথা শেষ হলে খরগোশ খুকখুক করে হেসে ফেলল, তা হলে দেখা যাচ্ছে তুমি অনেক বুড়ো। কিন্তু যে-মই বেয়ে তোমরা আকাশে তারা পুঁততে উঠতে সে-মই যে-গাছের ডাল দিয়ে তৈরি সেই গাছটা আমার হাতে বসানো। চারা থেকে সেই গাছ বড়ো হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, মই-গড়ার মতো শক্ত পোক্ত হয়েছে। তাহলে তো বয়সে আমি তোমার ঠাকুরদা -বলেই সে ফের পাতা সাজিয়ে ফেলে খাবার দিতে বলল।

এমন সময়ে ব্যাং হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তা দেখে হরিণ আর খরগোশ থমকে গিয়ে দুজনে প্রথমে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বলল, কী হল ব্যাং, তুমি এমন কেঁদে উঠলে কেন? কেঁদো না ভাই, কেঁদো না।

হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ব্যাং বললে, তোমাদের কথা শুনে কত পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। তোমরা তো জানো আমার তিন ছেলে ছিল। তারা তিনজনেই তিনটে গাছ পুঁতেছিল। গাছগুলো বেশ বাহারি হয়েছিল। তা তোমরা যে ওই আকাশে পেরেক দিয়ে তারা বসাবার কথা বলছিলে না, সেই পেরেক পোঁতার হাতুড়ির হাতল তৈরি হয়েছিল বড়োছেলের বসানো গাছের ডাল দিয়ে। মেজোছেলেটার গাছের গুঁড়ি দিয়ে লাঙল তৈরি করে তা দিয়ে ওই

যে আকাশে ছায়াপথ দেখছ না, তার খাত তৈরি হয়েছে, আর ছোটোছেলের গাছের গোড়া দিয়ে তৈরি তুরপুনে চাঁদ আর সূর্যের ঠিক মধ্যিখানের মস্ত ছ্যাঁদা গড়া হয়েছে। দুঃখের কথা বলব কী এসব কাজ শেষ হবার আগেই বুড়ো হয়ে আমার ছেলেরা সব মরে গেছে। ও হো হো, সে কবেকার কথা।

ব্যাঙের কথা শুনে হরিণ আর খরগোশের মুখে কথা সরে না, তারা চুপটি করে বসে রইল। বুড়ো ব্যাং পাতা পাততেই ভোজের খাবার তার পাতে ঘরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হল।

বেচারা ব্যাং

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বড়ো এক নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে বাস করত এক বুড়ি। বুড়ির সঙ্গে থাকত তার নাতনি, বুনো-লোমে ভর্তি একটা কুকুর আর সবুজ রং এক ব্যাং।

দিদিমার বাড়িতে বাচ্চা মেয়েটার বেশ সুখে-শান্তিতে দিন কাটছিল। নাতনিকে বুড়ি খুব ভালোবাসত। তার সুবিধে-অসুবিধের দিকে দিনরাত নজর রাখত বুড়ি। নাতনিকে সে সাজিয়ে রাখত সুন্দর সব পোশাকে। আর তার জন্যে রাঁধত নানা স্বাদের সব খাবার।

বুনো-লোমের কুকুরটা অবশ্য ততটা ভাগ্যবান ছিল না। কুকুরটাকে একেবারেই যত্ন-আত্তি করত না বুড়ি। সামান্য খাবারের জন্যে তাকে সর্বক্ষণ খাটাত। আর অত খাটাখাটুনি করেও কুকুরটা যা খেতে পেত তা আর কিছুই নয়, - পাতের এঁটোকাঁটা।

এদিকে সবুজ ব্যাঙের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। তার দিকে বুড়ির কোনো নজরই ছিল না। দিনরাত বেচারা ব্যাং শুধু খেটে খেটে মরত। তাকে বয়ে আনতে হত জল। কেটে আনতে হত কাঠ। আর দিনের শেষে পেটের খিদেয় চুই চুই করতে করতে ব্যাং-কে চলে যেতে হত বিছানায়।

একদিন সারাক্ষণ বুড়ি ব্যাংটাকে শুধু বকাঝকা করতে লাগল। সারাদিন কিছুই খেতে দিল না তাকে। সন্ধের সময় বুড়ি ব্যাং-কে পাঠাল নদীতে। বরফের গর্ত থেকে জল তুলে সেই জল বয়ে আনতে হবে ব্যাং-কে। ক্রমাগত কাজ করতে করতে ব্যাং খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বুড়ির কথা অমান্য করার সাহস তার নেই। অবশ্য বুনো-লোমের কুকুরটাকে ব্যাং সঙ্গী হিসেবে পেল।

তারা দুজনে নদীর কাছে এল। বরফের গর্তের সামনে বসে তারা কাঁদতে লাগল। চাদের দিকে তাকিয়ে তারা কাঁদতে লাগল।

–ও চাঁদ তুমি আমাদের একটু দয়া করে ...গ্যাঙর গ্যাং, গ্যাঙর গ্যাং ... সবুজ ব্যাং বিলাপ করতে লাগল। - 'আকাশ থেকে নেমে এসো তুমি ...গ্যাঙর গ্যাং !বুনো-লোমের কুকুর আর

আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাড়িতে, গ্যাঙর গ্যাং'–হাপুস নয়নে দুজনে কাঁদছে। অবশেষে চাঁদের কানে পৌঁছোল তাদের বিলাপ। চাঁদের খুব দুঃখ হল ওদের দুজনের জন্যে। আকাশ থেকে নেমে এল চাঁদ, হাজির হল একেবারে নদীতে ভাসমান বরফের ওপর। বুনো –লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং-কে চাঁদ তুলে নিল তার কোলে। তারপর উড়ে গেল আকাশে।

এদিকে ব্যাং কখন জল বয়ে আনবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বুড়ি। শেষমেশ ব্যস্ত হয়ে সে নিজেই নদীর দিকে গেল। কিন্তু বুনো-লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং-কে কোথাও দেখতে পেল না। বুড়ি চেঁচামেচি শুরু করল। ডাকতে লাগল কুকুরটাকে। বকাঝকা করতে লাগল ব্যাং-কে। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনও সাড়া নেই। তারপর বুড়ির চোখ গেল আকাশের দিকে। সে দেখতে পেল চাঁদের কোলে বসে আছে কুকুর আর ব্যাং। তারা দুজনে পাশাপাশি বসে ছিল আর খেলা করছিল।

– “ওরে আমার ব্যাং। ওরে আমার কুকুর!'–বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলছিল –'আমি তোদের এত খাওয়ালুম, যত্নআত্তি করলুম। নিজের নাতিপুতির মতন তোদের বড়ো করলুম আর তোরা কি না আমাকে ছেড়ে চলে গেলি ?”

কিন্তু বুড়ি হাজার কান্নাকাটি করলেও ওরা আর ফিরে এল না। এখন বুড়ি শুধু তার নাতনিকে নিয়ে ছোটো বাড়িটাতে থাকে। আর সেই থেকে বুনো-লোমের কুকুর আর সবুজ ব্যাং চাঁদের বাড়িতেই রয়ে গেছে।

তোমরা যদি চাঁদের দিকে তাকাও ওদের দুজনকে ঠিক দেখতে পাবে।

শেয়ালের বালিশ

সুধীন্দ্র সরকার

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছিল বিরাট একটা জঙ্গল। দিনের বেলাতে সেই জঙ্গলে আলো ঢুকতে পারত না। এত ঘন ছিল তার গাছগাছালি। আর রাতে চাঁদের আলোর তো ঢুকতেই মানা। তাই সবসময় আঁধার ঘিরে থাকত সেই জঙ্গলে। সেই অন্ধকারের রাজত্বের রাজা ছিল একটা ভাল্লুক। তার এক মন্ত্রী ছিল। সে হচ্ছে নেকড়ে। আর কুকুর ছিল সেনাপতি।

একদিন একদল লালঝুটি মোরগ ছুটতে ছুটতে এল রাজার কাছে। জঙ্গলে একটা দুষ্টু শেয়াল আছে, তার নামে নালিশ করতে। ওরা বললে, 'রাজামশাই ! রাজামশাই ! আমরা যে আর বাঁচিনে।'

ভাল্লুকরাজা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন? কী হয়েছে তোদের?'

“কোঁকর কোঁকর কো ! কোঁকর কোঁকর কোঁ!' বলে কাঁদতে কাঁদতে বনমোরগের দল একসঙ্গে বলে উঠল, 'দুষ্টু শেয়ালটা রোজ রাতে আমাদের এক-একজনকে মেরে খেয়ে ফেলছে।'

“অ্যাঁ ! সে কী? আচ্ছা আমি দেখছি!' বলে ভাল্লুকরাজা চিৎকার করে করে ডাকতে লাগল, 'শেয়াল ! অ্যাই দুষ্টু শেয়াল।'

দুষ্ট শেয়ালটা বোধ হয় কাছেপিঠে কোথাও লুকিয়ে ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল সব কথা। ভাল্লুকের ডাক শুনে একলাফে সেখানে হাজির হল। ওর হাতে একটা ছোট্ট বালিশ। তারপর, রাজাভাল্লুক কিছু বলার আগেই বলতে শুরু করল, 'হুক্কা হুয়াই ! হুক্কা হুয়াই পেন্নাম হই রাজামশাই। আপনার জন্যে একটা বালিশ এনেছি। রাতে মাথায় দিয়ে শুলে আপনার আরাম হবে। কাল সারারাত জেগে এটা তৈরি করেছি। এটা মাথার নীচে রাখলে আবার স্বপ্নও দেখবেন। আপনি কি এটা নেবেন?'

রাজাভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললে, 'কেন নেব না? নিশ্চয় নেব। ভালোবাসার দান কি ফেরাতে হয়।

দুষ্টু শেয়াল ভাল্লুককে বালিশটা দিতে দিতে বললে, 'আমি আপনার আরামের জন্যে কত চিন্তা করি। কিন্তু, এই লালঝুঁটি মোরগগুলো কিছুতেই বোঝে না।”

বালিশটা ছিল তুলোর মতো নরম। পালকের মতো হালকা। ভাল্লুকরাজা বালিশটায় ঠেস দিয়ে বসে মেজাজে দেখতে লাগল বনের শোভা। আর শুনতে লাগল পাখপাখালির ডাক। বনমোরগগুলো মিহিসুরে কঁক কঁক করতে করতে রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজামশাই ! আমাদের জন্যে কী করলেন?'

রাজাভাল্লুক রেগেমেগে চিৎকার করে উঠল, 'দূর হ ! আমি কোথায় স্বপ্ন দেখার কথা ভাবছি, আর তোরা কি না ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে এসেছিস নালিশ করতে। ভাগ।' লালঝুটি বনমোরগের দল কী আর করে? দৌড়ে পালায় সেখান থেকে।

দুষ্টু শেয়ালের তো পোয়াবারো। রাজামশাই হাতের মুঠোয় যখন, ওর আর ভয় কী। সেই রাতেই শেয়ালটা আবার মোরগছানা মেরে খেল। একটা নয়, দু-দুটো।

বনমোরগের দল এবার আর রাজার কাছে গেল না। গেল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী হল গিয়ে নেকড়ে।

মন্ত্রী নেকড়ের কাছে বনমোরগের দল ফের নালিশ জানাল, 'কোঁকর কোঁ। কোঁকর কোঁ। আমাদের বাঁচান মন্ত্রীমশাই।'

“তোরা তো দিব্যি বেঁচে আছিস দেখছি।' মন্ত্রী নেকড়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল, 'কেমন দাঁড়িয়ে আছিস আমার সামনে।'

‘আমাদের ছানাগুলোকে বাঁচান। বনমোরগের দল লালঝুটি নাড়াতে নাড়াতে বললে, 'দুষ্টু শেয়াল ফের আমাদের দুটো ছানাকে খেয়েছে।'

'ও। বুঝেছি!' বলে নেকড়ে তখনই তলব পাঠাল শেয়ালকে।

শেয়াল তো আগেভাগে সব জানত। সে এক দৌড়ে মন্ত্রীর সামনে এসে নাকিসুরে বললে, 'হুক্কা হুয়াই। হুক্কা হুয়াই। পেন্নাম হই মন্ত্রীমশাই।'

শেয়াল ছোট্ট একটা বালিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সেটা মন্ত্রীমশাইয়ের সামনে রেখে ফের বললে, 'আমি আপনার জন্যে একটা মজার বালিশ এনেছি। বালিশটা মাথায় দিলে এখনই আপনার ঘুম এসে যাবে।

'সে কী রে? কই দেখি কী রকম মজার বালিশ। নেকড়ে ধারালো দাঁত বের করল, 'খালি মাথায় শুয়ে শুয়ে মগজ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।'

দুষ্টু শেয়ালটা নেকড়েমন্ত্রীর কাছে বালিশটা দিতে দিতে বলে, 'আমি আপনার আরামের জন্যে কত চিন্তা করি। কিন্তু, এই বনমোরগগুলো কিছুতেই বোঝে না।'

নেকড়ে তখন পালকের মতো হালকা বালিশে হেলান দিয়ে মোরগগুলোকে ধমকাল, 'দূর হ তোরা ! শেয়াল যা ভালো বুঝেছে—করেছে।

বনমোরগের দল ভয় পেয়ে ছিটকে গেল এদিক-সেদিক। শেয়ালেরও সাহস গেল বেড়ে। সেই রাতে সে তিনটে মোরগছানা দিয়ে রাতের খানা সারল। তাই বলে বনমোরগের দল কিন্তু বসে রইল না। তারা কুকুর-সেনাপতির কাছে কেঁদে-কেটে পড়ল। বলল তাদের দুঃখের কথা। কুকুর রাগে গজগজ করতে করতে সেপাই পাঠাল দুষ্টু শেয়ালকে ধরে আনতে। কিন্তু, শেয়াল তার আগেই এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে সেই পুরোনো কথা, 'হুক্কা হুয়াই। হুক্কা হুয়াই। পেন্নাম হই সেনাপতিমশাই। আপনি সারারাত জেগে জঙ্গল পাহারা দেন। কত কষ্ট আপনার। তাই আপনার আরামের জন্যে একটা বালিশ এনেছি। বালিশটা মাথায় দিলে আপনার সারারাতের ক্লান্তি দূর হবে।

দুষ্টু শেয়াল কুকুর-সেনাপতির কাছে বালিশটা এগিয়ে দিল।

কুকুর-সেনাপতি বালিশটা নাকের কাছে এনে দুবার শুঁকল। বুঝতে পারল শেয়ালের চালাকি। ছিঁড়ে ফেলল বালিশটা। একরাশ পালক বেরিয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগল। দুষ্টু শেয়াল মোরগছানার মাংস খাওয়ার পর, তাদের পালক দিয়েই বালিশ তৈরি করে। আর, এইভাবে সে পালকের বালিশ উপহার দিয়ে রাজা আর মন্ত্রীর কাছে ভালো শেয়াল সেজেছে। রাগে দাঁতকড়মড়িয়ে উঠল সেনাপতির।

ভৌ ভৌ চিৎকার করে কুকুর -সেনাপতি অন্য সব কুকুরদের ডেকে বললে, 'এসো সবাই মিলে লোভী শেয়ালকে অকাজের উপযুক্ত পুরস্কার দি।

'দুষ্টু শেয়াল দৌড়ে পালাতে গেল। পারল না। কুকুরেরা সকলে মিলে শেয়ালকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল।

ভৌ ভৌ চিৎকারে কেঁপে উঠল জঙ্গল। আর লালঝুঁটি বনমোরগের দল বাঁচল হাঁফ ছেড়ে।